মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৩য় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আগস্ট ২০২২

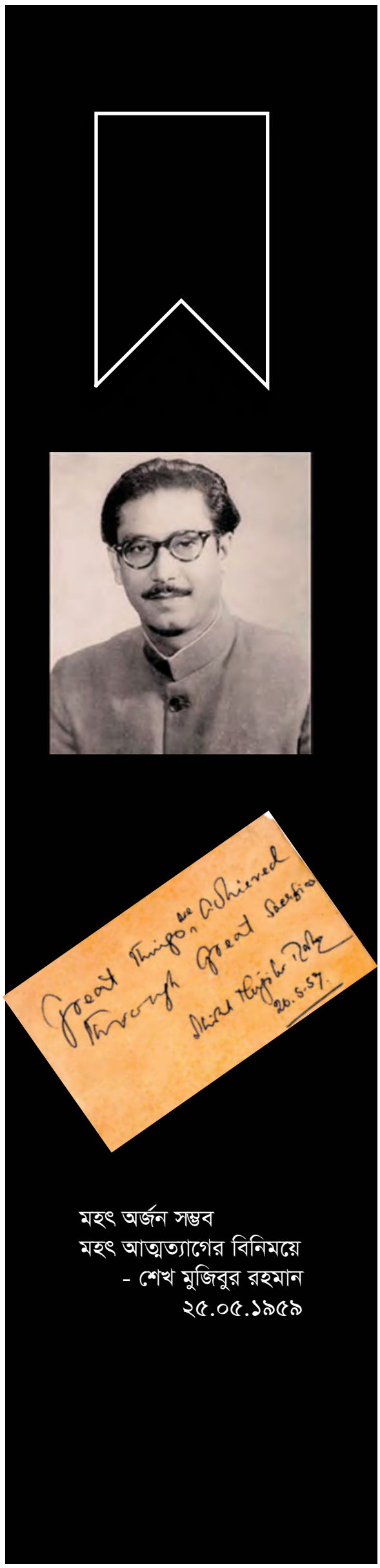

৯৭তম জন্মদিন

‘তাজউদ্দীন আহমদের রাজনীতি এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়’

বাংলাদেশের ইতিহাসে ভাস্বর ব্যক্তিত্ব ও মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ৯৭তম জন্মদিন উপলক্ষে গত ২৩ জুলাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্মরণানুষ্ঠান আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। মূল বক্তব্য প্রদান করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইাতহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সুলতানা আক্তার। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন লেখক ও সাংবাদিক ইমতিয়ার শামীম।

ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী তাঁর সূচনা বক্তব্যে বলেন ‘মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতি বছর এই দিনে আমরা তাজউদ্দীন আহমদকে স্মরণ করে আসছি। তাজউদ্দীন আহমদের রাজনৈতিক জীবনে আমরা তিনটি স্তর দেখতে পাই। প্রথম স্তরটি ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পূর্ব পর্যন্ত। যেখানে তিনি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ সহচর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। দ্বিতীয় স্তরটি তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের এই সময়ে সরকারের প্রশাসন গড়ে তুলেছেন, যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং, অস্ত্র জোগাড়, শরণার্থীদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। পাশাপাশি তিনি বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের জন্য কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। এই কাজগুলো তাঁকে করতে হয়েছিল খুব জটিল একটা পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে। দেশ মুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত সংসার ধর্ম পালন থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন। তৃতীয় স্তরটি ১৯৭২-৭৫। যেহেতু দেশের অধিকাংশ মানুষ গৃহহারা তাই তিনি দেশে ফিরে কাপাসিয়ার ভাঙ্গা ঘরবাড়িটি পুনর্নির্মাণ করেননি। ১৯৭৪ সালে তাঁকে মন্ত্রী সভা থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। বাংলাদেশের জন্য এটি মঙ্গল

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

মহৎ অর্জন সম্ভব
মহৎ আত্মত্যাগের বিনিময়ে
- শেখ মুজিবুর রহমান
২৫.০৫.১৯৫৯

হিরোশিমা দিবসের আয়োজন

বিশ্বজুড়ে নেমে আসুক শান্তি

৬ আগস্ট ২০২২

‘এই আমাদের প্রার্থনা/ এই আমাদের উচ্চারণ/ বিশ্বজুড়ে নেমে আসুক শান্তি’। যখন গোটা বিশ্ব পার করছে এক অস্থির সময়, লক্ষ লক্ষ শিশুর সামনে অনিশ্চিত শৈশব-কৈশোর, তখন বাংলাদেশের একঝাঁক শিক্ষার্থী এমন প্রার্থনায় যোগ দেয়। ৬ আগস্ট ২০২২ প্রতিবছরের মত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আঙ্গিনা সেজে ওঠে শিক্ষার্থীদের বানানো কাগজের সাদা সারস পাখিতে। সাদা সারস তৈরি করে জাদুঘর প্রাঙ্গণ সাজিয়ে তারা স্মরণ করে সাতাত্তর বছর আগে ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকি নগরিতে নিক্ষিপ্ত পারমানবিক বোমার ভয়াবহতাকে। স্মরণ করে হিরোশিমায় পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয়ার সুদুর প্রসারি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফলে মৃত্যুবরণকরা তাদেরই বয়সী কিশোরী সাদাকো সাসাকিকে। ৬ আগস্ট ২০২২ হিরোশিমা দিবসের আয়োজন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর করে থাকে শিশু-কিশোরদের নিয়ে, ট্রাস্টি মফিদুল হক তাদের উদ্দেশে বলেন, আর কোন শিশুকে যেন এমন নিষ্ঠুরতা আলিঙ্গন করতে না হয়, সাদাকো মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শান্তির সারস বানিয়ে আগামীকে সুন্দর করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছিল, আজকে এই শোকাবহ আগস্ট মাসে আমরাও অঙ্গীকারাবদ্ধ হই শোক থেকে শক্তি আহরণ করতে।

বাংলাদেশস্থ জাপানি রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ১৯৯৯ সাল থেকে হিরোশিমা দিবস পালন করার জন্য। তিনি মনে করেন এই আয়োজন অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে অহিংসা এবং শান্তির তাৎপর্য তুলে ধরবে। সাদাকো সাসাকির কাহিনী পাঠ করে মিরপুর গার্লস আইডিয়াল স্কুলের ছাত্রী সায়মা আলম অহনা এবং দৃষ্টি দাস। এরপর শুরু হয় মূল পর্ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক আয়োজনেটিতেও শিশু-কিশোররা হিরোশিমা দিবস ঘিরে আবৃত্তি, সঙ্গীত এবং নৃত্য পরিবেশন করে। শুরুতেই কচিকাঁচার মেলার বন্ধুরা ঘাতক পারমানবিক অস্ত্র এবং যুদ্ধবাদের বিপরীতে দৃঢ় কন্ঠে উচ্চারণ করে-

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতার জন্য

বজলুর রহমান স্মৃতিপদক-২০২১ প্রদান অনুষ্ঠান

২৯ জুলাই ২০২২

বাংলাদেশে সাংবাদিকতা এবং সাংবাদিকরা একটি গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। পাকিস্তান আমলে যখন গণতন্ত্র নির্বাসনে যায়, তখন ইত্তেফাক পত্রিকার তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, পাকিস্তান অবজারভারের আবদুস সালাম, দৈনিক সংবাদের নূর হোসেন চৌধুরীর মত পথিকৃত সাংবাদিকরা তাঁদের প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অবলম্বন করে সত্যনিষ্ঠ, সাহসী সাংবাদিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। স্মরণ করা যেতে পারে ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে তারা 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে এক অভিন্ন সম্পাদকীয় রচনা করে প্রকাশ করেন যা দাঙ্গা প্রসমনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযুদ্ধকালে পৃথিবীজুড়ে সাংবাদিকরা বাংলাদেশে পাকিস্তান বাহিনীর হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের তথ্য এবং বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামকে তুলে ধরে এর পক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিলেন, যাদের অবদান বাঙালি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। এই ধারাবাহিকতা বহন করেছেন যারা তাদের মধ্যে উজ্জ্বল নাম বজলুর রহমান, যিনি সাংবাদিকতাকে অবলম্বন করে দেশকে গণতন্ত্রের পথে, বাঙালিকে স্বাধিকার সংগ্রামে অনুপ্রণিত করেছেন। এই বিরল স্বভাব ও সাহসিকতার মানুষটি মৃত্যুবরণ করেন ২০০৭ সালে। তার পরিবারের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গত ১৪ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতার জন্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের জন্য 'বজলুর রহমান স্মৃতিপদক' প্রদান করে আসছে। ২৯ জুলাই ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো বজলুর রহমান স্মৃতিপদক-২০২১ প্রদান অনুষ্ঠান।

এবছর ইলেকট্রনিক মিডিয়া ক্যাটাগরিতে সেরা প্রতিবেদকের সম্মাননা লাভ করেন একাত্তর টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার পার্থ সঞ্জয় তার বিশেষ প্রতিবেদন 'একাত্তরের বসু বাহিনী'-এর জন্য। রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিচালনায় সবশ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ ছিল প্রকৃত অর্থে গণযুদ্ধ, যার বড় একটি অংশ আজও আমাদের জানার বাইরে রয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের তেমনই এক অনালোকিত অধ্যায়, 'একাত্তরের বসু বাহিনী'। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ট্রেনিং ও অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া গড়ে ওঠা এক দুর্ধর্ষ বাহিনী। ব্যাপক প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে কিশোরগঞ্জের বিস্তীর্ণ হাওড়ে মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলা এই বাহিনীর নাম আতঙ্ক ছড়াতো পাকিস্তানি আর্মি আর রাজাকারের মনে। বাহিনী প্রধান আবদুল মোতালেব বসু ছিলেন হাওড়াঞ্চলের ডাকাত সর্দার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর জেল থেকে বের হয়ে স্থানীয় নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন একটি বাহিনীর প্রধান। 'বসু বাহিনীর' একমাত্র নারী মুক্তিযোদ্ধা সখিনা বেগম বোনের ছেলে হত্যার বদলা নিতে রাম দা দিয়ে পাঁচজন রাজাকারকে কুপিয়েছিলেন। এই তিনপর্বের ধারাবাহিকে এখনো বসু বাহিনীর অনেক মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি না পাওয়ার কথা যেমন আছে, তেমনি মুক্তিযোদ্ধা সখিনা বেগমের শেষ জীবনের বঞ্চনার কথাও তুলে ধরা হয়েছে।

প্রিন্ট মিডিয়া ক্যাটাগরিতে যুগ্মভাবে বিজয়ী হয়েছেনে সমকাল পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার আবু সালেহ রনি এবং প্রথম আলো পত্রিকায় গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য শাহাদুজ্জামান ও ডা. খাইরুল ইসলাম। সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত আবু সালেহ রনির দুই পর্বের ধারাবাহিকের প্রথম পর্বের শিরোনাম ছিল '১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধ: মোড় ঘোরানো ঘটনাবলি' এবং দ্বিতীয় পর্বের শিরোনাম 'বিজয় প্রতিদিন'। '১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধ: মোড় ঘোরানো ঘটনাবলি' পর্বে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে মওলানা ভাসানীর চিঠি ও বিবৃতি, ইয়াহিয়ার ধুম্রজালের পাল্টা জবাব সৈয়দ নজরুলের, ১১ সেক্টরে রণাঙ্গনের যুদ্ধ কৌশল নির্ধারণ প্রতিবেদনসমূহ, মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকা এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনার তথ্য তুলে ধরে। প্রতিবেদক পাঠকদের কাছে ধারাবাহিক রিপোর্টের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি পর্যালোচনার পাশাপাশি তার প্রেক্ষাপট এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঘটনাগুলোর প্রভাব তুলে ধরেছেন।

প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত পাঁচটি প্রতিবেদনে গবেষক শাহাদুজ্জামান এবং ডা. খাইরুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের ৫টি অনালোচিত বিষয়কে তুলে ধরেছেন। তাদের প্রতিবেদনে জানা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ অধ্যাপক জিসি দেব-এর হত্যাকাণ্ডের পর যুক্তরাষ্ট্রের পেনসেলভেনিয়া থেকে তার গুণগ্রাহী এক মার্কিন তরুণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছিলেন ডা. জি সি দেব বেঁচে আছেন কিনা, এই চিঠি এক আলোড়ন তৈরি করে, পাশাপাশি শরণার্থীদের চিকিৎসাসেবা এবং শরণার্থী শিবিরে মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে তাদের অনুসন্ধানি প্রতিবেদন সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয়কে সামনে নিয়ে আসে।

পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আ ক ম মোজাম্মেল হক এম পি। তিনি মনে করেন মুক্তিযুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস জাতির সামনে তুলে ধরতে গণমাধ্যমের পাশাপাশি গবেষকদের আরো বেশি সক্রিয় হতে হবে। এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভূমিকা এবং কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন তিনি। অনুষ্ঠানের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং জুরিবোর্ডের সভাপতি আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বহু মানুষের অবদান। তাদের অনেকের কথা বলা হয় না, তারা রয়ে যান দৃষ্টির আড়ালে। মুক্তিযুদ্ধকে প্রত্যক্ষ না করা কিছু তরুণ সাংবাদিক মুক্তিযুদ্ধের অজানা কথা বা নাজানা মানুষগুলোকে খুঁজে বের করছেন। তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলছেন।

নতুন প্রজন্ম যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী হচ্ছে এটা আনন্দদায়ক। শুরুতে সকলকে স্বাগত জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, স্বাধীনতার পরে দীর্ঘ সময়ে একঝাঁক তরুণ সাংবাদিক তৈরি হয়েছেন যারা কেবল এ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছেন বলে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করেন না বরং নিজ দায়িত্বে দেশের আনাচে কানাচে, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের অজানা তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরছেন। আজকে মুক্তিযুদ্ধ যে জীবন্ত ইতিহাস সে গৌরবের অধিকারি একঝাঁক তরুণ সাংবাদিক। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি এবং সদস্য-সচিব সারা যাকের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অসংখ্য তথ্য-উপাত্ত আছে যা এ প্রজন্মের গবেষকদের গবেষণার জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনুসন্ধানি গবেষণার এখনই সময় বলে তিনি মনে করেন এবং একাজে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভবিষ্যতে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মুক্তির বারান্দা : আলোচনা ও পাঠের নতুন পরিসর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ক্যাফেটেরিয়া সংলগ্ন উন্মুক্ত বারান্দা ঘিরে এবার তরুণ লেখক এবং প্রকাশকবৃন্দ আয়োজন করতে পারবে স্বল্পব্যায়ী বইপ্রকাশনা উৎসব। গ্রন্থ আলোচনা, সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর জন্য থাকবে স্বরোচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, কাব্য আলোচনার আসর আয়োজন করার সুযোগ। সুযোগটি পাওয়া যাবে খুবই সামান্য বিনিময় মূল্যে। তবে আয়োজন হতে হবে মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে। বারান্দাটির নামকরণ হয়েছে মুক্তির বারান্দা। এই বারান্দায় প্রথম অনুষ্ঠানটি হলো বই প্রকাশনার। গত ২৭ জুলাই ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সোহেল সুলতান জুলকারনাইন কবির সম্পাদিত 'বিজয়ের ময়দানে রাণীশংকৈল' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের 'মুক্তির বারান্দায়'।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর হয়ে উঠবে তরুণদের মুক্তিযুদ্ধ চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। তরুণরা তাদের নানা সৃজনশীল আয়োজন নিয়ে মুখরিত করবে জাদুঘর প্রাঙ্গণ, পাশাপাশি তারা জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করে সম্পৃক্ত থাকবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাথে।

নতুন প্রজন্মের সামনে জল্লাদখানায় গণহত্যার ইতিহাস

নতুন প্রজন্মের সামনে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও গণহত্যার ইতিহাস তুলে ধরতে দীর্ঘ দুই যুগের বেশি সময় ধরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠেও রয়েছে এমন কিছু নিয়মিত কর্মসূচি যার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, গণহত্যার ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে বাঙালিসত্ত্বা ও নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিভৎসতা অনুভব করতে পারে। প্রতি শনিবার শহীদ পরিবারের সাথে নতুন প্রজন্মের সাক্ষাৎকারমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় জল্লাদখানা প্রাঙ্গণে।

মিরপুরস্থ কাজী আবুল হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম ও ১০ম শ্রেণির ৪৯ জন শিক্ষার্থী জল্লাদখানা পরিদর্শনে আসে। সাক্ষাৎকার দেন শহীদ আব্দুল আজিজ মোল্লার পুত্র মো: নাজিমউদ্দিন মোল্লা। জল্লাদখানা পরিদর্শন শেষে শিক্ষার্থীরা জল্লাদখানা প্রাঙ্গণের সবুজ ঘাসের উপর সারিবদ্ধভাবে বসে। শহীদ সন্তানের মুখ থেকে তার পরিবারের সদস্যদের গণহত্যার ঘটনা শোনার জন্য। শুরু হয় তার বাবা শহীদ আব্দুল আজিজ মোল্লা, দাদা শহীদ বরকত আলী মোল্লা ও চাচা শহীদ শহীদুল্লাহ মোল্লার একত্রে হত্যাকাণ্ডের বিভৎস ঘটনা। নাজিম উদ্দিন মোল্লা সেদিনের সেই হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'আমার বাবারা ছিলেন পাঁচ ভাই, চার বোন। আমার বড় চাচা শহীদুল্লাহ মোল্লা ছিলেন আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ কর্মী। ২৫ মার্চ থেকে পাকিস্তানি হানাদাররা এদেশের জনগণের উপর যে নির্মম হত্যাকাণ্ড চালায় তার প্রতিবাদে আমার চাচা শহীদুল্লাহ মোল্লা বাড়িতে কালো পতাকা তোলেন। সেদিন থেকেই মূলত তাঁরা স্থানীয় বিহারিদের টার্গেটে পরিনত হন।

দিনটি ছিল ৯ এপ্রিল ১৯৭১, শুক্রবার। সকাল আনুমানিক এগারটার দিকে বাড়ির ছেলেরা গোসল করে প্রস্তুত হচ্ছিল জুম্মার নামাজের জন্য। ঠিক সেই মুহূর্তে বিহারি ও পাকবাহিনী আমাদের বাড়ি ঘিরে ফেলে। প্রায় ঘন্টাখানেকের মতো পালাবার নিষ্ফল চেষ্টা করেও তাঁদের শেষ রক্ষা হয়নি। প্রথমে তারা আমার চাচা শহীদুল্লাহ মোল্লাকে আটক করে। এরই মধ্যে আমার বাবা আব্দুল আজিজ মোল্লা ও দাদা বরকত আলী মোল্লা বাড়ির পেছন দিক থেকে পালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু বিহারিরা তদেরকেও ধরে ফেলে। তিনজনকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের পরিবারের সকলেই তাদের পিছুপিছু যান এবং অনুরোধ করেন তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু তারা কারও অনুরোধই শুনলো না। আমার মা রাহেলা বেগম তাদের পেছন পেছন যাচ্ছিল তাদেরকে কোথায় নেয় তা জানার জন্য। কিন্তু কিছুদূর যাবার পরই পাকবাহিনী তা টের পেয়ে যায়। মা-কে তারা বেয়নেট দিয়ে আঘাত করায় মা আর তাদের পিছু পিছু যেতে পারেন না। মা যতদূর দেখেছেন বাবা আব্দুল আজিজ মোল্লা, চাচা শহীদুল্লাহ মোল্লা এবং দাদা বরকত আলী মোল্লাকে পাকবাহিনী আর বিহারিরা জল্লাদখানা সংলগ্ন ধানক্ষেতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।'

তারপর! তারপর কি হল! হঠাৎ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলো। পাকিস্তানিরা কি তিনজনকেই হত্যা করেছিল?

আড়ষ্ট কণ্ঠে নাজিম উদ্দিন বললেন 'হ্যাঁ। ওরা আমার বাবা, চাচা, দাদা তিনজনকেই নির্মমভাবে হত্যা করে এই জল্লাদখানার কূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। পরে অনেক খুঁজেও তাঁদের লাশ উদ্ধার করতে পারিনি। কারণ এই কূপের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের লাশ ফেলেছিল পাকিস্তানি আর বিহারিরা। এত লাশের ভিড়ে আমরা সেদিন তাঁদের লাশ খুঁজে পাইনি। এই বলে নামিজউদ্দিন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ১৯৯৯ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই কূপটি খনন করে এখান থেকে শহীদদের মাথার খুলি ও অস্থিখন্ড উদ্ধার করে। আমার মা রাহেলা বেগম এটা শুনে ছুটে আসেন জল্লাদখানায় বাবার অস্থির সন্ধানে। ২৮ বছর আগের সেই বিভৎস ঘটনা আবারো মনে পড়ে যায় আমাদের। ২০০৫ সালে আমার মা রাহেলা বেগম মারা যান। মারা যাবার পূর্ব পর্যন্ত তার একটাই দাবী ছিল এই গণহত্যা যারা করেছে তাদের যেন শাস্তি হয়। অবশেষে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে এবং হচ্ছে। তাই শহীদের সন্তান হিসেবে সরকারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আর তোমাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ তোমরা বাংলাদেশটাকে বাঁচিয়ে রেখো। ৩০ লক্ষ শহীদের কথা তোমরা কোনদিন ভুলে যেও না।'

শহীদ সন্তানের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: আনোয়ারুল ইসলাম তাঁর যুদ্ধকালীন সময়ের বীরত্বের গল্প শোনান। দেশকে মুক্ত করার প্রয়াসে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের চিত্র প্রতিফলিত হয় তাঁর স্মৃতিচারণে।

এর মধ্য দিয়ে জল্লাদখানার গণহত্যার ইতিহাস ও মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে পারে নতুন প্রজন্ম। জল্লাদখানায় গণহত্যার ইতিহাসের পাশাপাশি খোঁদাই করা ৪৭৭টি বধ্যভূমির গণহত্যা, বিশ শতকে সমগ্র বিশ্বের গণহত্যা সম্পর্কেও তাদের ধারণা হয়। সমগ্র বাংলাদেশই যে একটা বধ্যভূমি তারা এটা উপলব্ধি করতে পারে। বলা বাহুল্য যে, ২০০৭ সাল থেকে চলমান এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ হাজারেরও অধিক। এভাবেই এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্ম গণহত্যার ঘটনা ও ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে পারছে।

প্রমিলা বিশ্বাস
সুপারভাইজার, জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস

নবীনদের অভ্যর্থনা ও গবেষণা বিষয়ক কর্মশালা

গত ৫ই আগস্ট মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস-এর নতুন গবেষণা সহকারী ও অনুষ্ঠান সহকারী এবং খণ্ডকালীন গবেষকদের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। গবেষণা সহকারী পদে তাবাসসুম ইসলাম তামান্না ও অনুষ্ঠান সহকারী হিসেবে মো. হাসিব চৌধুরী যোগদান করেন। এছাড়াও দুটি ভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের জন্য খণ্ডকালীন গবেষণা সহকারী হিসেবে আনিকা জুলফিকার, তাবাসসুম নিগার ঐশী, নুসাইবা জাহান, মেহজাবিন নাজরান ও মো. জাহিদ উল ইসলাম যুক্ত হন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস-এর পরিচালক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। তিনি নতুনদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রেক্ষাপট ও জাদুঘরের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন। বর্তমান প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত গণহত্যার ইতিহাস তুলে ধরা এবং একইসাথে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেন্টারের চলমান গবেষণা প্রকল্প বিষয়ক ধারণা প্রদান করেন। নতুনদের জন্য সেন্টারের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সেন্টারে সদ্য যোগদানকারী সমন্বয়ক ইমরান আজাদ এবং গবেষণা কার্যক্রমের বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করেন অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী গবেষক শাওলি দাশগুপ্ত। সদ্য বিদায়ী অনুষ্ঠান সহকারী হাসান মাহমুদ অয়ন নতুন যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন জাদুঘরের গবেষণা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপক ড. রেজিনা বেগম, কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম, সহকারী আর্কাইভ কর্মকর্তা সোফিয়া নাজনিন নিতা ও মন্টু বাবু সরকার, হিসাব রক্ষক মো. কামাল উদ্দিন এবং জাদুঘরের ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) চন্দ্রজিৎ সিংহ।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের শেষ পর্যায়ে নরওয়ে থেকে অনলাইনে বক্তব্য প্রদান করেন সেন্টারের সদ্য বিদায়ী সমন্বয়ক ও বর্তমানে অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক নওরিন রহিম। তিনি সেন্টারের কর্মী হিসেবে কর্মরত অবস্থায় কোন কোন বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা উচিত, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে জাদুঘরের স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে গবেষণা বিষয়ক কর্মশালা পরিচালনা করেন সমন্বয়ক ইমরান আজাদ। ইমরান আজাদের উপস্থাপনায় অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান শেষে নতুন যোগদানকারী কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীরা জাদুঘরের বিভিন্ন গ্যালারি পরিদর্শন করেন।

মো. হাসিব চৌধুরী

একাত্তরে আমি যে কিছু করেছি, এ-প্রজন্ম কী করে জানবে?

পুরুশ বাওকার ভারতীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ফিল্মস ডিভিশনের আলোকচিত্রগ্রাহক। তবে তার চাইতেও বড় পরিচয় হলো, তাঁর নামটি বাংলাদেশের জন্মলগ্নের সাথে জড়িয়ে আছে। ১৯৭১ সনের জুলাই থেকে ডিসেম্বর এই পুরো সময়কাল জুড়েই তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন ছবি ও ফুটেজ ক্যামেরায় ধারণ করেছেন। কেবল তাই নয়, তাঁর ১৬ মিমি ক্যামেরাতেই বন্দি হয়ে আছে ১৬ ডিসেম্বর বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে জেনারেল অরোরার নেতৃত্বে যৌথ বাহিনীর কাছে নিয়াজিসহ পাকিস্তানি হানাদারদের আত্মসমর্পণের দৃশ্য। সব মিলিয়ে পুরুশ বাওকার অন্তরালে থাকা ইতিহাসের আশ্চর্য এক সময়ের সাক্ষী।

৮৫ বছর বয়সী পুরুশ বাওকার অবসর জীবন যাপন করছেন এখন। মারাঠি ভাষায় প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনীর উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে আছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা, তাঁর ভাষায় যা ছিল তাঁর জীবনের সেরা অর্জন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ফিল্ম সেন্টারের পরিচালক তারেক আহমেদ সম্প্রতি ১৭ তম মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। উৎসব চলাকালে উৎসবের আয়োজক ফিল্মস ডিভিশন, ইন্ডিয়া তাদের প্রাক্তন সহকর্মী পুরুশ বাওকারকে সম্মাননা প্রদান করে। উৎসব জুরি **তারেক আহমেদ** পুরুশ বাওকারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। যার অংশবিশেষ প্রকাশিত হলো।

পুরুশ বাওকার : ১৯৭১-এ বাংলাদেশের সাথে আমার সংযুক্ত হবার পেছনে বেশ কিছু কথা আছে। আমার সেই সময়কার এবং আগেকার সব কাজগুলো এর একটি কারণ। যা অস্বীকার করার উপায় নেই, আমাকে বাংলাদেশে যেতে হয়েছিল কারণ যাবার জন্য অন্য কেউ রাজি ছিল না। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গিয়ে মাঠ পর্যায়ে ঘটনার সংবাদভাষ্য সংগ্রহ করতে কলকাতার সিনিয়র চিত্রগ্রাহকসহ অন্য সকলেই অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

তারেক আহমেদ : কোন মাসে এসেছিলেন, মনে পড়ে?

পুরুশ বাওকার : যতটুকু মনে পড়ে, সেটা জুলাইয়ের কোন একটা সময়। চলচ্চিত্র বিভাগে অনেক ক্যামেরাপারসন ছিলেন কিন্তু কেউ যেতে চাইলেন না। আমিও নিশ্চিত ছিলাম না যে বাংলাদেশে যেতে পারবো। কারণ তখন আমি অনেকগুলো তথ্যচিত্রের কাজ করছিলাম, যে কারণে আমার বোম্বে থাকা দরকার ছিল। সে সময়ে চলচ্চিত্র বিভাগের ডেপুটি চিফ ছিলেন মি. প্রমোদ পতি। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং জানালেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিবের সাথে এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে আমাকে সেদিনই দিল্লি যেতে হবে। যেহেতু কেউ যেতে চাচ্ছে না, আমি জানতাম আমাকে বাংলাদেশ যেতে হবে। কাজেই আমি দিল্লি গেলাম। আলোকচিত্র বিভাগের মি. কুমার এবং দূরদর্শনের সাউন্ড রেকর্ডিস্ট মি. ভরদ্বাজও সেখানে ছিলেন। আমরা তিনজন এক মিলিটারি হাসপাতালে গেলাম চেকআপের জন্য। সেখানকার ডাক্তারও জানতেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ যেতে চাইছে না, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি যেতে চাও?' উত্তরে জানালাম আমি সে কারণেই এসেছি। তখন আমি অনুমতিপত্র পেলাম। কলকাতায় এলাম। ১০ দিন কলকাতায় ছিলাম, কিন্তু কেউ কোন সাহায্য করল না। দিল্লিতে বিষয়টি জানাতে তারা আমাকে আগরতলার টিকেট পাঠালো। আমি প্রথমে আগরতলা গেলাম, সেখান থেকে তেলিয়ামোড়। এখান থেকেই আমি শুটিং শুরু করলাম জুলাই মাসে। প্রতিদিন আমরা এত এত জায়গায় শুটিং করতাম যে এখন সবগুলো জায়গার নাম মনে নেই।

কিছুদিনের মধ্যেই আমরা বুঝতে পারছিলাম সামনে যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় আসতে যাচ্ছে। সুতরাং পনেরই ডিসেম্বর আমরা বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলে যাই। স্থানটি ইতোমধ্যে ভারতীয় বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। সেখান থেকে রাত্রে আমার দুই সহকর্মীসহ আরেকটি স্থানে যাই, নামটি এখন মনে পড়ছে না, সম্ভবত বাংলাদেশের বিখ্যাত পাটকলটি সেখানে অবস্থিত। আমরা সকাল পর্যন্ত সেখানে ছিলাম। সকালে উঠে রওনা হলাম, দেখলাম একজন ব্রিগেডিয়ার রিকশায় করে হেলিপ্যাডের দিকে যাচ্ছেন, সেখান থেকে আকাশপথে ঢাকা যাবেন। আমার মনে হলো কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, সহকর্মী মি. কুমারকে সাথে নিয়ে হেলিকপ্টারের কাছে গেলাম এবং ওনার সাথে ঢাকায় গেলাম। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় এসে জানলাম আত্মসমর্পণ হতে যাচ্ছে। ঢাকা এয়ারপোর্টে জেনারেল অরোরাসহ সকলের চিত্রধারণ করলাম, জেনারেল নিয়াজিও সেখানে ছিলেন। এয়ারপোর্টে শুটিং শেষ করলাম, তারপর গেলাম আত্মসমর্পণ যেখানে হবে সেই স্থানে। সেখানে আরো অনেক আলোকচিত্রী ছিলেন। আমি দেখলাম জেনারেল দু'জন বসেছেন। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে ক্যামেরার দৃষ্টি টেবিলের উপর স্থির করলাম, এর মানে এই না যে আমি কেবল ঐ দুজনকেই ধারণ করতে চেয়েছি, সবকিছুই শুট করে ফেললাম দ্রুত, কারণ আমাকে শুট করতে হচ্ছিল ১৬ মিমি ক্যামেরাতে । পরবর্তীতে আমার এই ১৬ মিমি-এ শুট করা ফিল্ম ফুটেজ ফিল্মস ডিভিশন ৩৫ মিমি-এ রূপান্তর করল। সময়মতো ফুটেজগুলো পাঠানো হলো, যাতে পরের দিনই সেগুলো সিনেমা হলে প্রদর্শন করা যায়।

তারেক আহমেদ : সে সময়ে বাংলাদেশে কেমন করে থাকতেন? কী খেতেন?

পুরুশ বাওকার: খাবার-দাবার আমার জন্য কখনোই কোন সমস্যা না। কেননা যে কোন জায়গায় যে কোন খাবার খাওয়ার অভ্যাস আমার ছিল। এখানে আমার কাজ ছিল আর্মি যখনই শুট করতে বলত, আমি ক্যামেরা চালু করতাম আর শুটিং করে যেতাম। আগে আমি ৩৫ মিমি আইএমও ক্যামেরা দিয়ে শুট করতাম, কিন্তু বাংলাদেশে সেটা সম্ভব হলো না। আমাদের অনেকটা পথ হাঁটতে হতো, আইএমও ৩৫ মিমি ক্যামেরা অনেক ভারি ছিল, আর যে কোন জায়গায় ব্যবহার করা যেতো না। ক্যামেরাটা চাবি দিয়ে অপারেট করা হোত। একবার চাবি ঘুরালে ১৮ ফিট ফিল্ম শুট হয়ে যেত। একবার চালু করার পর যদি অন্য কিছু শুট করার দরকার হতো, সেটি করা যেতো না। কাজেই মি. পাইনকে বললাম আমাকে একটি ১৬ মিমি ক্যামেরা পাঠাতে।

তারেক আহমেদ : কখনো কখনো কি খুব ভীতিকর মনে হতো?

পুরুশ বাওকার : ভীতিকর না। ভারতীয় আর্মি আমাকে যখন যেখানে শুট করতে বলেছে আনন্দের সঙ্গে করেছি।

তারেক আহমেদ: যদি পাকিস্তানি আর্মিরা আপনাকে ধরে ফেলতো?

পুরুশ বাওকার : আমার সাথে তো তাদের কারো দেখা হয়নি। সারারাত যুদ্ধ করে ভোর ছয়টায় তারা ফিরে যেতো।

তারেক আহমেদ : সারা রাত?

পুরুশ বাওকার : সারা রাত যুদ্ধ, তারা চাইতো না দিনে কিছু করতে। সারাদিন আমাদের আর ওদের আর্মি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতো।

তারেক আহমেদ : মুক্তিফৌজের সাথে আপনার কোন যোগাযোগ হয়েছিল?

পুরুশ বাওকার : একবার তাদের সাথে আমার দেখা হয়েছিল যখন আমি ভারতীয় আর্মির এক অফিসারের সাথে কাজ করছিলাম। খুব শক্তিশালী মানুষ ছিল। তাঁরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিলো, আমি কেবল এটুকুই বলতে পারি। তারপর আমি ফিরে আসি। মুক্তিবাহিনীর সাথে থাকা সম্ভব ছিলো না। হয়তো অন্যরকম কিছু ঘটতে পারতো। আমি অফিসকে বললাম আমাকে একটা জিপ দিতে। আমি জিপে করে যেতাম।

তারেক আহমেদ : শরণার্থীদের দেখেছিলেন?

পুরুশ বাওকার : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে আগরতলা, পশ্চিমবঙ্গে অনেক শরণার্থী আসতে থাকে। সেসব দৃশ্য আমি শুট করেছিলাম। শরণার্থী বিষয়ে আমি আগে থেকেই জানতাম।

তারেক আহমেদ : ১৯৭১-এর পর কি বাংলাদেশে গিয়েছেন?

পুরুশ বাওকার : না, না, না।

তারেক আহমেদ : গত পঞ্চাশ বছরে কেউ আপনাকে আমন্ত্রণ জানায়নি?

পুরুশ বাওকার : কেউ আমন্ত্রণ জানায় নি, আমাকে তো কেউ চেনেই না। একাত্তরে আমি যে কিছু করেছি, এ-প্রজন্ম কী করে জানবে?

জাতীয় শোক দিবস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোকদিবসে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সকল দর্শনার্থীদের জন্য বিনা প্রবেশমূল্যে উন্মুক্ত ছিল।

৪৭তম শাহাদত বার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভে সংরক্ষিত দলিলপত্র থেকে:

৭ মার্চ ১৯৭১ রমনার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ জাতিকে অনুপ্রাণিত করে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে। একই সাথে এই ভাষণের পর দেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিজ্ঞাপনের ভাষাও বদলে যায়। তারা বঙ্গবন্ধুর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের আদলে তাদের ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন তৈরি করে, যা ছাপা হয় উল্লেখযোগ্য দৈনিক পত্র-পত্রিকায়। এই বিজ্ঞাপনগুলো অসহযোগ আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে যোগ করে নতুন মাত্রা।

দৈনিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন:

আগস্ট মাসে পাকিস্তান সরকার সামরিক আদালতে গোপনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচারের প্রহসন শুরু করে। বঙ্গবন্ধুকে আটক রাখা হয়েছিল লায়েলপুরের কারাগারের নি:সঙ্গ কুঠুরিতে। বিচারের জন্য তাঁকে আনা হয় সাহিয়ালে। সাংবাদিকের কাছে পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বক্তব্য পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিতে ঝোলাতে তারা ছিল বদ্ধপরিকর। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠে গোটা বিশ্ব।

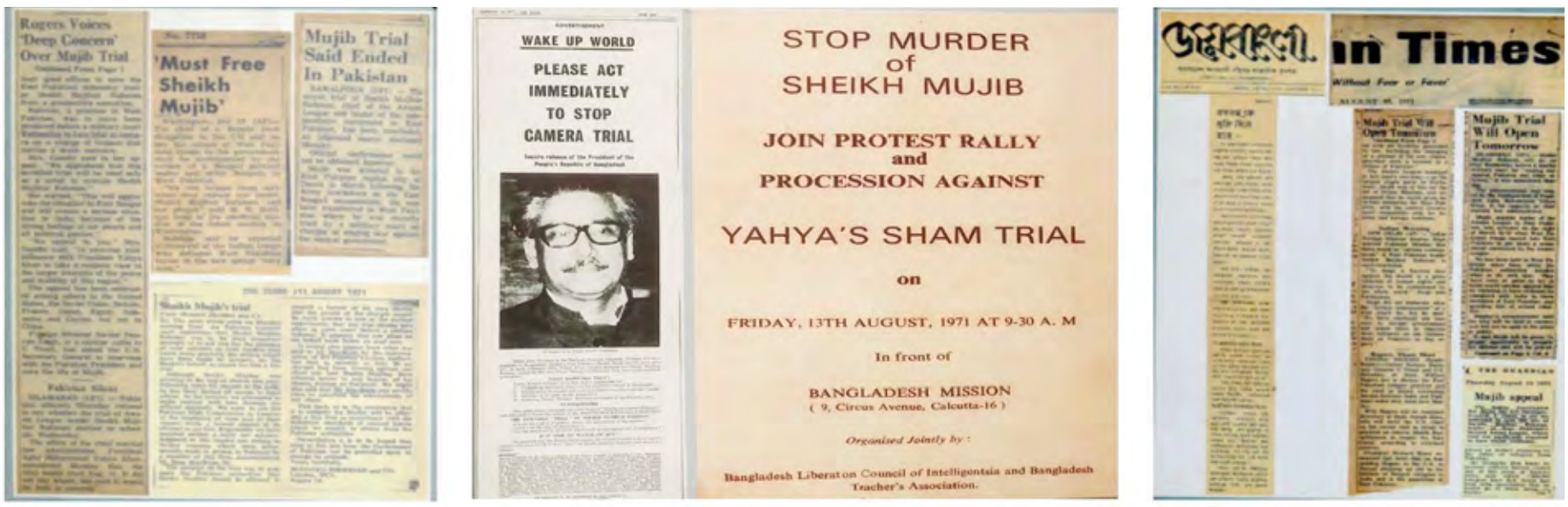

ভুলি নাই শহীদের কোন স্মৃতি/ ভুলব না কিছুই আমরা

শহীদ সৈয়দ হাফিজুর রহমান

সৈয়দ হাফিজুর রহমান ছিলেন ঢাকা বেতারের যন্ত্রী, টিভির সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক। যশোরে এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানি বাহিনী তাঁর বাবাকে গুলি করে হত্যা করলে তিনি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ২৯ আগস্ট ভোরে মগবাজার থেকে পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি আর ফিরে আসেননি।

শহীদ সৈয়দ হাফিজুর রহমানের ব্যবহৃত চশমা।

দাতা: সৈয়দ মতিউর রহমান

শহীদ অধ্যাপক আব্দুল ওয়াহাব তালুকদার

অধ্যাপক আব্দুল ওয়াহাব তালুকদার কুড়িগ্রাম কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন ৬নং সেক্টরের বামনহাট যুদ্ধশিবিরের ইনচার্জ ছিলেন। ৭ আগস্ট ১৯৭১ পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধে তিনি নিহত হন। পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে ব্রাশফায়ার ও বেয়নেট চার্জে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে।

শহীদ অধ্যাপক আবদুল ওহাব তালুকদারের পরিধেয় রক্তাক্ত লুঙ্গি, মাফলার ও প্যান্ট

দাতা: মোহাম্মদ মিজানুর রহমান তালুকদার

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলম (বদি) বীর বিক্রম

বদিউল আলম বদির পারিবারিক ডাক নাম ছিল তপন। তিনি ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে অধ্যয়নরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন তিনি প্রথমে ২নং সেক্টরে যোগ দেন পরে ঢাকার গেরিলা দল 'ক্র্যাক প্ল্যাটুন'-এর সদস্য হিসেবে বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। ২৯ আগস্ট শহীদ আলতাফ মাহমুদ ও শহীদ রুমির সাথে পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকেও ধরে নিয়ে যায়। এরপর তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

দাতা: মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাকিম

আমার বাড়ি রংপুরের হরিদেবপুর এলাকার গঙ্গাদাস গ্রামে। একাত্তর সালে আমি স্থানীয় কুতুবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণিতে পড়ি। বয়স ষোল-সতেরো হবে। ছাত্র অবস্থাতেই আমি রাজনীতি সচেতন ছিলাম। রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ শুনে আমি উদ্বুদ্ধ হই। পরবর্তীতে ২৮ মার্চ যখন রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করা হয় আমি সেখানে যুক্ত হই। আমার বাড়িটা ছিল ক্যান্টনমেন্ট থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে। পাকবাহিনী গ্রামে এসে নানা রকম অত্যাচার শুরু করে। এপ্রিল মাসের প্রথম শুক্রবারে পাকবাহিনী লাহিড়ীহাট নামক জায়গায় অনেক লোককে একত্র করে হত্যা করে। এরপর আমরা ৩০/৪০ জন গ্রাম থেকে পায়ে হাঁটা পথে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হই। সাথে ছিল আমার চাচা সেনাসদস্য তবারক ও মকবুল, জেঠাতো ভাই রাজা মিয়া ও বাদশা মিয়া, মামাতো ভাই নাদের ও বেলায়েত। পথে আমরা তৎকালীন এমপি/এমএলএ আওয়ামী লীগ নেতা সিদ্দীক হোসেনের বাড়িতে উঠি। তিনি সম্পর্কে আমার চাচার সম্বন্ধি। তিনি আমাদের দার্জিলিং-এর মূর্তিক্যাম্পে পাঠান। সেখানে আমরা ২৮ দিনের সম্মুখ ও গেরিলা ট্রেনিং সম্পন্ন করলাম। আমরা ছিলাম ব্র্যাভো কোম্পানিতে। এই ক্যাম্পেই পরিচয় হয় 'গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে' বইয়ের লেখক মাহবুব ভাইয়ের সাথে। এই মূর্তি ক্যাম্পে একদিন দেখা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় ছেলে শেখ কামাল ভাইয়ের সাথে। শেখ কামাল ভাই আমাদের পরের ব্যাচে ট্রেনিং নেন। আমাদের গ্রামের সবাইকে দুই ভাগে ভাগ করে এক ভাগ পাঠিয়ে দেয়া হয় ৬নং সেক্টরে রংপুরে আমাদের নিজের এলকায়। আরেক ভাগ পাঠিয়ে দেয়া হয় দিনাজপুরে। আমি ও মাহবুব ভাই একই গ্রুপে যুদ্ধে যাই। মে মাসের শেষ দিকে মূর্তি থেকে আমরা ভারতের ভিতরে চাউলহাটি ক্যাম্পে অবস্থান নিই। প্রথমে আমরা বিভিন্ন জায়গায় গেরিলা যুদ্ধ করি। তারপর আস্তে আস্তে পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হই। আমাদের কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন নুরুল হক। টুআইসি ছিলেন মাহবুব ভাই। তার নিচে পিন্টু ভাই। পরবর্তীতে মাহবুব ভাই সব চালাতেন। একবার আমি এবং আমার এক সহযোদ্ধা ছদ্মবেশে পাকবাহিনীর ক্যাম্প র‍্যাকিতে যাই। আমি বড়শি ও ডুলি হাতে নিজে জেলের বেশ নিই এবং আমার সহযোদ্ধা ঘাসকাটার লোক। পরবর্তীতে আমাদের দুজনকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে খুব নির্যাতনের শিকার হলেও পরে ওরা আমাদের ছেড়ে দেয়। পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে আটক থাকার ফলে আমার সেবারের র‍্যাকি শতভাগ সফল হয়। আমাদের র‍্যাকির ওপর ভিত্তি করে সে রাতে আমরা ওই পাকিস্তানি ক্যাম্পে আক্রমণ করি। অন্যদিকে আমাদের গ্রামের বাড়িতে পাকবাহিনী অভিযান চালায়। যেহেতু আমাদের পরিবারের অনেকে যুদ্ধে গিয়েছে তাই ওরা আমার বাবাকে ক্যান্টনমেন্ট ধরে নিয়ে যায়। সেখানে বাবাকে অমানসিক নির্যাতন করা হয়। এদিকে আমরা রাতে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করি আবার দিনে সম্মুখ যুদ্ধ করি। এমনি এক সম্মূখ যুদ্ধ হয় অম্বরখানা ইউনিয়ন পরিষদে। সেখানে পাকিস্তানিদের শক্ত ঘাঁটি ছিল। প্রথমবার আক্রমণে গিয়ে আমরা তিন দিক দিয়ে প্রতিরোধের শিকার হই। আমাদের একজন সহযোদ্ধা মিঠাপুকুরের গোলাম গাউস সে যুদ্ধে শহিদ হয়। পরে অবশ্য অম্বরখানা ক্যাম্প আমাদের দখলে আসে। রজবআলী নামে আমাদের এক গাইড ছিল। পাকবাহিনী ডিফেন্স পিছাতে থাকে আর আমরা ধীরে ধীরে অ্যাডভান্স করতে থাকি। নভেম্বর মাসের শেষ নাগাদ আমরা পঞ্চগড় পৌঁছে যাই। তারপর মিত্রবাহিনী ঢুকে পড়ে। যুদ্ধ শেষে সবকিছু গোজগাজ করে বাড়ি ফিরতে আমার একটু সময় লেগেছিল। এদিকে সবাই ভেবেছিল আমি হয়তো মারা গেছি। অবশেষে ২৮ ডিসেম্বর আমি বাড়ি ফিরলে দশগ্রামের মানুষজন আমাকে দেখতে আসে। পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে বাবাকে যে অমানসিক নির্যাতন করে তিনি তার ধকল সহ্য করতে পারেননি। স্বাধীনতার ছয় মাসের মধ্যে আমার বাবা মারা যান। বড় ছেলে হিসেবে গোটা পরিবারের দায়িত্ব আমার ওপর ন্যাস্ত হয়।

সাক্ষাৎকার গ্রহীতা : **শরীফ রেজা মাহমুদ**

জাদুঘর কর্মকর্তার যুক্তরাষ্ট্র সফর

আমার সকল বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী আপনারা জেনে খুশি হবেন, আমি যুক্তরাষ্ট্রের International Visitors Leadership Programme (IVLP) -এর জন্য মনোনীত হয়েছি!

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বিশ্বের অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তি বিভিন্ন সময় এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। তাই 'মুজিব শতবর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী'তে এ- প্রাপ্তি আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের। আমেরিকান এম্বাসি বাংলাদেশ থেকে মোট পাঁচজনকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের কাজের বিশেষত্ব ও গুরুত্ব বিবেচনায় মনোনীত করেছে।

২৪ জুলাই থেকে কার্যক্রম শুরু হয়। জুলাই থেকে আগস্ট' ২২ সময়কালীন মোট চারটি সিটি যথাক্রমে ওয়াশিংটন ডিসি, ইন্ডিয়ানোপলিস, ইন্ডিয়ানা, আইওয়া সিটি ও ভার্জিনিয়ায় অবস্থান করবো। সকলের শুভকামনা প্রত্যাশা করছি।

আমেনা খাতুন
কিউরেটর, আর্কাইভ এন্ড ডিসপ্লে

তাজউদ্দীন আহমদের রাজনীতি

১ম পৃষ্ঠার পর

বয়ে আনেনি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে শহিদ হয়েছেন।'

'তাজউদ্দীন আহমদের রাজনীতি এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়' শিরোনামে মুখ্য আলোচনায় ড. সুলতানা আক্তার বলেন, '১৯৪৩ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করলেও, এখানে অসাম্প্রদায়িক উদার ও প্রগতিশীল মনোভাব সম্পন্ন কর্মীদের সাথে তাঁর সখ্যতা গড়ে ওঠে। এখানকার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে তিনি পূর্ব বাংলা ইকোনমিক ফ্রিডম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। এটি গণআজাদী লীগ নামে পরিচিত ছিল। পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার দাবি এই সংগঠন থেকেই প্রথম উত্থাপিত হয়। ১৯৪৭ সালে তিনি উদারপন্থী যুবকদের সাথে নিয়ে গণতান্ত্রিক যুব লীগ গঠন করেন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি যে ছাত্র সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা হয় তিনি তার প্রাথমিক উদ্যোগতা ছিলেন, কিন্তু দলটির মুসলিম শব্দটি থাকার ফলে প্রথমে তিনি যোগদান করেননি। সেবছর ২৬ মার্চ তাঁর লেখা ডায়েরিতে তিনি এ অঞ্চলের স্বাধীনতার ইঙ্গিতমূলক মনোভাব প্রকাশ করেন। এরপর ১৯৪৯ সালে ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় তিনি এর অন্যতম প্রাথমিক উদ্যোগতা। তিনি পূর্বপাকিস্তানে মুসলিম লীগের অপসাশনের বিপক্ষে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন বিধায় তিনি প্রথমে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেননি। পরবর্তীতে ১৯৫৩ সালে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হলে তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেন। পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশ নামের রাজনৈতিক ভাবনাটি জনসমক্ষে এভাবে না আসলেও তিনি কিন্তু সেসময় থেকে পৃথক স্বাধীন দেশের কথা পরিচিত মহলে আলোচনায় আনেন। ১৯৫৪ সালের যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেন। ১৯৫৫ সালে তাঁরই উদ্যোগে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম কথাটি বাদ দেয়া হয়। সেবছর তিনি আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক হন। ১৯৫৭ সালে মাওলানা ভাষানী ন্যাপ প্রতিষ্ঠা করলে অনেকে দল ত্যাগ করলেও তিনি এটা বুঝতে পেরেছিলেন পুর্বপাকিস্তানের মানুষের মুক্তির জন্য আওয়মী লীগের বিকল্প নাই। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে তিনি গোপনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দলকে চাঙ্গা করেন। ১৯৬২'র শরীফ কমিশনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৬৩ সালে সোহরাওয়র্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালের দলীয় কাউন্সিলে আওয়ামী লীগের সাংগঠিনিক সম্পাদক নির্বচিত হয়ে জেলায় জেলায় ঘুরে দলকে পুনরোজ্জীবিত করেন। ১৯৬৬ সালের ছয়দফা প্রনয়ণে বঙ্গবন্ধুর পর তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এসময় তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপর জেলে থেকেই তিনি ছয়দফা বিরোধী নবাব নসুরুল্লাহর পিডিএম-এর ষড়যন্ত্র নঃসাৎ করেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন সরকারের সাথে আলোচনার স্বার্থে বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দীনের ওপর আস্থা রেখেছিলেন। এই আস্থা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। একাত্তরের মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর সাংগঠনিক ভূমিকা ছিল অসামান্য। ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুকে পাকবাহিনী গ্রেফতার করলে তিনি দল ও জাতির হাল ধরেন। মুক্তিযুদ্ধে তার ভূমিকা নতুন করে বলবার নয়। সবশেষে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন আর সেই স্বপ্নের রূপকল্প স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে তাজউদ্দীন পালন করেন নির্ণায়কের ভূমিকা।'

লেখক ও সাংবাদিক ইমতিয়ার শামীম তার আলোচনায় বলেন, 'তাজউদ্দীন আহমদের কাছে আমাদের যা ঋণ তা আকাশ সমান। যে মানুষটি দীর্ঘ নয় মাস ধরে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জাতিকে পথ দেখালেন স্বাধীনতার পর আমরা বোধ হয় সেই মানুষটিকে সঠিক মর্যাদা দিতে পারিনি। স্বাধীন বাংলাদেশে তাজউদ্দীন যে ভূমিকাটি রাখতে পারতেন আমরা সেই সুযোগ তাঁকে করে দিতে পারিনি। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। তাজউদ্দীন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেছিলেন। একই সাথে বঙ্গবন্ধুকেও আমরা তাজউদ্দীনের বিষয়ে কোন বিরূপ বক্তব্য দিতে দেখি না। তিনি কেন স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে শেষ পর্যন্ত কাজ করতে পারলেন না সেটা গবেষণা করে উদঘাটন করতে হবে। তাজউদ্দীন আহমদ আজও প্রাসঙ্গিক এবং ভবিষ্যতেও প্রাসঙ্গিক থাকবেন।'

এছাড়াও অনুষ্ঠানে তাজউদ্দীন আহমদের চিঠি ও দিনপঞ্জি থেকে পাঠ করেন সৈয়দ শহীদুল ইসলাম নাজু ও তামান্না সারোয়ার নিপা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে দর্শক সমাগমে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি জাদুঘরের অফিসিয়াল ফেসবুক পাতায় সরাসরি সম্প্রচার হয়েছে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম।

শরীফ রেজা মাহমুদ

বিশ্বজুড়ে নেমে আসুক শান্তি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

"আমি দিয়েছি ৩ হাজার চেরিফুলের চারা আর চাঁদ,
ওয়শিংটনের আকাশ আলো করে রোদ-জ্যোৎস্নায় নৃত্য খেলে চেরি,
পটোমাকের আয়নায় জলকেলী, সারি সারি ফুটফুটে ব্লসমের ছায়াপরী
পর্যটক, পাখিদের শান্তিনিকেতন।
আর তুমি দিয়েছো দুটি অতি ক্ষুদ্র উপহার- লিটিল বয় আর ফ্যাটম্যান
এবং একলক্ষ পনেরো হাজার মৃত্যু।
হানামি উৎসবে আমি এখনো কাঁদি। কুঁকড়ে কষ্ট পাই, কাঁপি ভূমিকম্পে।
৬ আগস্ট ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল মানবতা ও মূল্যবোধ। আমরা শিশুরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই।"

এরপর তারা একে একে পরিবেশনকরে সঙ্গীত তুমি নির্মল কর/ মঙ্গল করে/ মলিন মর্ম ঘুঁচায়ে, রানার ছুটেছে/ তুমি রবে নিরবে হৃদয়ে মম। যুদ্ধ নয় যুদ্ধ নয়, আলোকের এই ঝর্ণাধারায়, নিখিলের আনন্দধারায় সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য পরেবেশন করে কচিঁকাচাঁর মেলার বন্ধুরা।

এরপর মঞ্চে আসে ভাষানটেক স্কুলের শিক্ষার্থীরা। হিরোশিমা দিবস উপলক্ষে স্কুলের রিশক্ষার্থীরা নিজেদে রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলকে চমৎকৃৎ করে। তাদের স্বরচিত গানে অনুপ্রানিত হয়ে বাংলাদেশস্থ জাপানি রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি জাপানি ভাষায় তা অনুবাদ করাতে আগ্রহী হন। তাদের গানের সুরেও ছিল চমক। বর্তমান সময়ে জনপ্রিয় এবং এ প্রজন্মের তরুনদেও পছন্দের একটি গানের সুরের সাথে লোকগানের সুর যোগ করে ভাষানটেক স্কুলের শিক্ষার্থীরা গায়
আজ বন্ধু ৬ আগস্ট/ তোমরা জানো কি

সাতাত্তর বছরেও আমরা ভুলতে পারি নি
এই গানের মধ্য দিয়ে তারা নিজেরাও যেমন ভুলে যাবেনা যুদ্ধেও বিভিষিকা, ঠিক তেমনি তাদেও বন্ধু, সহপাঠীসহ যে শিক্ষার্থীরা শুনবে গানটি তারাও মনে রাখবে ৬ই আগস্টেও দুঃখগাঁথা।
শিশুদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলি-
'যুদ্ধ মানে হানাহানি, যুদ্ধ মানে মৃত্যু
নিষ্পাপ মানুষগুলো ঝরে যায় শুধু'।

ভারতীয় ফরেন সার্ভিস অফিসার ট্রেইনিদের (২০২১ ব্যাচ) মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

গত ১৬ জুলাই ২০২২, ৯ সদস্যের ভারতীয় ফরেন সার্ভিস ট্রেইনি অফিসারদের একটি দল (২০২১ ব্যাচ) মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ড. সারওয়ার আলী এবং জাদুঘরের কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের স্বাগত জানান। তারা শিখা চির অম্লানের সমুখে দাঁড়িয়ে একাত্তরের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে ডা. সারওয়ার আলী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস বিষয়ক সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করেন। দলটি "বাংলাদেশের ***মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস***" শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্রটি দেখে জাদুঘরের ৪টি গ্যালারি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বর্তমান Eswatini সাবেক Swaziland-এর শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর জাদুঘর পরিদর্শন

বর্তমান Eswatini সাবেক Swaziland-এর শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী Senator ManqobaKhumalo, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের Under Secretary Cebile Amanda Nhlabatsi একই মন্ত্রণালয়ের Director MSME Mr. MlulukiSakhile Dlamini ও Eswatini Investment Promotion Authority -এর Senior Executive Manager Dr. Khanyisile Dlamini গত ১৮ জুলাই সকালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। জাদুঘর পরিদর্শনকালে তাদের সাথে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক চন্দ্রজিৎ সিংহ এবং কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম। জাদুঘর পরিদর্শন শেষে ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের-এর সঙ্গে তারা আলোচনায় মিলিত হন।

আগামীর আয়োজন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৭তম শাহাদাৎ-বার্ষিকী স্মরণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর 'তরুণদের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক আলোচনা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে।
আগামী ১৯ আগস্ট ২০২২, শুক্রবার, বিকেল পাঁচটায় জাদুঘর মিলনায়তনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন তরুণ আলোকচিত্রী ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা সাইফুল হক অমি। অনুষ্ঠানে তরুণ নির্মাতা জান্নাতুল ফেরদৌস আইভী নির্মিত 'বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনৈতিক অবদান', আরেফিন আহমেদ নির্মিত '১৪ বছরের জেল জীবন' এবং সোহেল মোহাম্মদ রানা নির্মিত 'মুজিব আমার পিতা' স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। অনুষ্ঠানে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।

শিক্ষা কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

গত ১১ আগস্ট ২০২২ ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (আইইউবি)-এর 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস' কোর্সের ১২০ জন শিক্ষার্থী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তারা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র দেখেন, গ্যালারি পরিদর্শন করেন এবং কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের নানা জিজ্ঞাসার উত্তর দেন এবং কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

উত্তরা ইউনিভার্সিটির শতাধিক শিক্ষার্থী শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৩ আগস্ট ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আয়োজিত ৭৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১২০ জন প্রশিক্ষণার্থী ১৩ আগস্ট ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এটি তাদের নিয়মিত কর্মসূচির অংশ।

'আঁরা রোহিঙ্গা' আলোকচিত্র প্রদর্শনী দর্শনার্থীদের মন্তব্য

বিশ্ব শরণার্থী দিবস উপলক্ষ্যে ইউএনএইচসিআর এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত আলোকচিত্র প্রদর্শনী গত ৭ জুলাই ২০২২ সমাপ্ত হয়। প্রায় ৪০০০ হাজার দর্শনার্থী এ প্রদর্শনি পরিদর্শন করেন। মন্তব্য খাতা থেকে প্রদর্শনী সম্পর্কে দর্শনার্থীদের যে মন্তব্য পাওয়া যায় তার কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হলো–

We are Rohingya is the short portrait of the history. This will teach us the empathy for humanity. Our best promise should be- Say human being not as a refugee. Our deepest thanks to Rohingyatopher magazine & UNHCR, Spanish Embassy & Liberation Wor Museum.

Obaidur Chowdhury (Ajoy)
26/06/2022

Seeing the humanity itself a great experience of all time. Today, I go through the walking in a deep emotion to saw each photos and it's carried a lot of distresses, losses etc. I'm great full to have in here and thanks for UNHCR programme to allow me here.

Nasrin Akter Dolly
AIUB, Depart of Law

তুমি বলো, কী লিখব!
সত্যিই কি কিছু আছে লেখার?
ছোট্ট পিচ্চিগুলো জানেও না তারা কি দেখতে এসেছে,
মানবতা কোথায়!
জাতিসংঘরা কী শুধু আলোচনাই করে যাবে?
আঞ্চলিক জোট করে লাভ কী!
রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান না করতে পারলে
সব কিছু বন্ধ হোক, আমেরিকার মানবতা বা
ব্রিটেনের মুক্ত চিন্তা কিছুই চাই না।

জয় বাংলা
কালের কাক

The parallel exhibition of 1971 refugee crisis and Rohingya refugee crisis has made me realize that how history repeats itself over and over again. I was wondering that how the persons who leave their homeland and take shelter in an alien land define their identity. Hore, identily becomes a subject to politics. Some say they are 'refuges', some say they are 'forcibly displaced nationals' where some say they are not 'our nationals'. I got my answer from a particular image where 'Sohana' has 'born in anywhere, citizen of everywhere. May all nuances diminishes and the identity of 'humanbing' prevails.

Qazi Fariha Iqbal
02.07.2022

I liked the exhibition very much cause though the photographs were, quite normal but every pics depicts different stories. Specially the photo of Sajid attracted me much were it is written, his smile is regular but actually his smile wanna say something i.e, I am not liking this refugee lifes. As usual but deep one I must say. Hop this kind of Exhibition tell the people that it carries an important message.

Md Abu Bakar Sakib
DUIR
02/07/2022

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম NBC News এবং Migrant Voice-এ রোহিঙ্গাটোগ্রাফার-এর ছবি নিয়ে শরণার্থী দিবসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত বিশেষ প্রদর্শনির সংবাদ-

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official